বৃহস্পতিবার, ১৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ১১৫

রাষ্ট্রপতিকে রাজ্যে নাগরিক সংবর্ধনা নজির সৃষ্টি করল

দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে আসীন হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে রাজ্যের উষ্ণ অভ্যর্থনায় অভিভূত রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। মঙ্গলবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে নাগরিক সংবর্ধনার মঞ্চ থেকে শুরুতেই বাংলায় তিনি বললেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।' এই মঞ্চে দাঁড়িয়েই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ সফরের জন্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সফরের জন্য বাংলাকে বেছে নেওয়ায় আমরা সম্মানিত। এদিন নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে তাকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয় রাজ্য সরকার। এই মঞ্চ থেকেই সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি গোটা দেশকে একসূত্রে বাঁধেন। তিনি সব জাতি, সব রাজনীতির ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রপতি দেশের প্রকৃত অভিভাবক। আমাদের সকলের অভিভাবক।

প্রণব মুখার্জি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির এই মন্তব্যে বাংলার মানুষ স্বাভাবিকভাবেই খুশি। রাষ্ট্রপতিকে নাগরিক সংবর্ধনা শিষ্টাচারের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দেশের সাংবিধানিক প্রধান। তাঁকে সম্মান জানানো কর্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী অতীতের সব বিরোধ ভুলে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দকে সম্মান জানিয়ে সারা দেশে এক বিরাট দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। রাষ্ট্রপতি সবার ঊর্ধ্বে। ভারতীয় গণতন্ত্রে তিনি সকলের। সুতরাং এখন আর তার কাছে দলমতের কোনও স্থান নেই। সব দলের নেতারাই প্রয়োজনে তাঁর কাছে যান আর্জি জানাতে। এবারে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন সর্বসম্মত হয়নি। বর্তমান রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রার্থী ছিলেন লোকসভার প্রাক্তন স্পিকার মীরা কুমার। এর আগেও রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন হয়েছে ভিভি গিরি রাষ্ট্রপতি হওয়ায় সময়ে। পরবর্তীকালেও হয়েছে। তবে এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কাদা ছোড়াছুড়ি না হওয়াই শ্রেয়। রাষ্ট্রপতি গোটা দেশকে একসূত্রে বাঁধেন। এটা বিস্মৃত হলে চলবে না।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

"শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে? পন্ডিতেরা কেবল বিতার করে।"

পন্ডিত—আমায় কেউ পন্ডিত বল্লে ঘৃণা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ--ঐটি তাঁর কৃপা! পন্ডিতেরা কেবল বিচার করে। কিন্তু কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে। সা৭াৎকারের পর সব নারায়ণ দেখবে—নারায়ণই সব হয়েছেন। পন্ডিত নারায়ণের স্তব শুনাইতেছেন। ঠাকুর আনন্দে বিভোর।

পন্ডিত --সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।

শ্রীরামকৃষ্ণ--আপনার অধ্যাত্ম (রামায়ণ) দেখা আছে?

পন্ডিত—আজ্ঞে হাঁ, একটু দেখা আছে।

শ্রীরামকৃ,ণ—ওতে জ্ঞান ভক্তি পরিপূর্ণ। শবরীর উপাখ্যান, অহল্যার স্তব, সব ভক্তিতে পরিপূর্ণ।

"তবে একটি কথা আছে। তিনি বিষযবুদ্ধি থেকে অনেক দূর"।

পন্ডিত—যেখানে বিষয়বুদ্ধি, তিনি 'সুদূরম্'—আর যেখানে তা নাই, সেখানে তিনি 'অদূরম্।' উত্তরপাড়ার এক জমিদার মুখুয্যেকে দেখে এলাম বয়স হয়েছে--কেব নভেলের গল্প শুনেছেন!

শ্রীরামকৃষ্ণ—অধ্যাত্মে আর একটি বলেছে যে, তিনিই জীব জগৎ

দিনপঞ্জিকা

১৩ অগ্রহায়ণ, ভাঃ ৯ অগ্রহায়ণ, **৩০ নভেম্বর,** ১৩ অঘোন, সংবৎ ১২ মার্গশীর্ষ সুদি,১০ রবি আউঃ। সূর্যোদয় ঘ ৬।৫, সূর্যাস্ত ঘ ৪।৪৭। **বৃহস্পতিবার,** দ্বাদশী রাত্রি ঘ ৩।৪০মিঃ। রেবতীনত্র দিবা ঘ ১।১মিঃ। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ঘ ৫।৪৬মিঃ। ববকরণ,অপরাহ্ন ঘ ৪।১৬ গতে বালবকরণ, রাত্রি ঘ ৩।৪০ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**—মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ঘ ১।১ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ, রাত্রি ঘ ৩।৪০ গতে দোষ নাই। **কালবেলাদি** ঘ ২।৭ গতে ৪।৪৭ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১১।২৬ গতে ১।৬ মধ্যে। যাত্রা—নাই, রাত্রি ঘ ৫।৪৬ গতে যাত্রা শুভ দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ঘ ১।৬ গতে নৈর্ঋতে অগ্নিকোণেও নিষেধ, রাত্রি ঘ ৩।৪০ গতে মাত্র দক্ষিণে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম—বিবাহ—রাত্রি ঘ ৬।৫০ গতে ১১।২৬ মধ্যে মিথুন কর্কট ও সিংহলগ্নে পুনঃ রাত্রি ঘ ২।৪১ গতে শেষরাত্রি ঘ ৬।৫ মধ্যে তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ।** **বিবিধ**—দ্বাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিন্ডন। দিবা ঘ ১০।৩৪ গতে একাদশীর পারণ। **গোস্বামিমতে ও নিম্বার্কসম্প্রদায়মতে অদ্য একাদশীর উপবাস**। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। **গোস্বামিমতে অখন্ডদানদ্বাদশী ব্রত। মৎস্যদ্বাদশী। শ্রীশ্রীনারদ ভগবানের আবির্ভাব। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর জন্মদিবস। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৩৯ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৫।৪৫ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৮ গতে ৩।৩৩ মধ্যে ও ৪।২৭গতে ৬।৫ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

১৩ অগ্রহায়ণ, ভাঃ ৯ অগ্রহায়ণ ৩০ নভেম্বর, ১৩ অঘোন, ১০ রবিঃ আউঃ। উঃ ঘ ৬। ৫, অঃ ঘ ৪।৪৭ বৃহস্পতিবার, দ্বাদশী রাঃ ঘঃ ৩।৪০।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

নয়া ভারতে কৃষির নবরূপ

জগদীপ সাক্সেনা
শেষ পর্ব

দেশজুড়ে কৃষি পর্যায়ভুক্ত মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করার ভিত্তিতে এ পর্যন্ত কৃষকদের মধ্যেও বিতারিত হয়েছে ৭.১ কোটিরও বেশি SHCS কার্ড। পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনার উদ্দেশ্য হল(PKVY) জৈবচাষ এলাকার সম্প্রসারণ করা। কারণ দেখা গিয়েছে, জৈব চাষ প্রথা তুলনামূলকভাবে স্বল্প ব্যয়ে ফসলের বেশি দাম পাবার কারণে কৃষকদের বাড়তি আয়ের সুযোগ এনে দেয়। কৃষকরা যাতে ক্লাস্টার গঠন করে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে জৈব চাষে অগ্রণী হন সেজন্য তাদের মধ্যে প্রচার অভিযান শুরু হয়েছে। সরকারি আর্থিক সাহায্যে ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে ৯১০০টি ক্লাস্টার এবং একই সঙ্গে উৎসাহিত করা হচ্ছে সম্ভাবনাময় বাজারে প্রেরণের জন্য জৈব পদ্ধতিজাত ফসলের সংগ্রহ ও তার পরিবহন ব্যবস্থাকে।

সরকারের অন্যতম ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচী, প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা পরিচালিত হচ্ছে, কৃষিজীবীদের জীবন-জীবিকা ও সুস্থায়ী আয় সুনিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। কর্মসূচীটিতে খুব কম প্রিমিয়ামের বিনিময়ে 'এক মরশুম এক হার' ভিত্তিতে সকল ধরণের খাদ্যশস্য, তৈলবীজ ও বার্ষিক অর্থকরী ফসলের ক্ষেত্রে বিমা কভারেজের সুযোগ রয়েছে। বীজ রোপণ থেকে শুরু করে খেতের ফসল ফলা অবধি শস্যবৃত্তের সকল ঝুঁকিকে এবং ফসল কাটার পরবর্তী ধাপের ক্ষয়ক্ষতিকে এই বিমার আওতাধীন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৫.৭৫কোটি কৃষক এই বিমার সুযোগ নিয়েছেন এবং আরও বহু সংখ্যক কৃষিজীবী মানুষ এর ছত্রছায়ায় আসবেন বলে মনে করা হচ্ছে। লক্ষ্য রাখা হচ্ছে, বিমাকৃত এলাকা যাতে ২০১৬-১৭-এর ৩০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ তে ৪০ শতাংশে পৌঁছায়। এই কর্মসূচী নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক এবং কৃষিতে বিনিয়োগের বহর বাড়ার সহায়ক। বাজারে বেশি দাম পাওয়াটাই হল কৃষকদের আয়বৃদ্ধির অন্যতম পূর্বশর্ত। সমস্যাটির সমাধানে ১৩টি রাজ্যের ৪১০-এর বেশি মাণ্ডি এক বাণিজ্যিক লেনদেনের সুবিধার্থে অভিন্ন ই-প্ল্যাটফর্মের দ্বারা সুসংবদ্ধ করা হয়েছে। অভিনব এই কর্মসূচীকে ই-নাম (জাতীয় কৃষি বাজার) বলা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৬৯টি কৃষিপণ্য বাণিজ্যযোগ্য মাপকাঠির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং ই-নাম প্ল্যাটফর্মে নথিভুক্ত হয়েছেন ৪৫ লক্ষের বেশি কৃষক। অভাবের তাড়নায় যৎসামান্য মূল্যে বিক্রি করা সহ দালাল ফড়েদের উৎপাত রোধ করার ফলে এই সংস্কার কৃষকদের আয় বাড়ানোর পথ সুগম করেছে। আর একটি ইতিবাচক প্রভাব হল কৃষিজাত সামগ্রীর পাইকারি মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতে শস্যের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে কৃষকদের আয়ও বাড়বে ৯.১ শতাংশ হারে। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার ঃ

কৃষকদের আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাঙ্খিত ফল পেতে গেলে আলোচ্য কর্মসূচীগুলির রূপায়ণে অবশ্যই সময়সীমা বেঁধে সম্পন্ন করতে হবে।

বাড়তি লাভের লক্ষ্যে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার বিষয়টি নিয়ে নীতি আয়োগের সাম্প্রতিক এক পলিসি প্রতিবেদনে ক্ষেত্রীয় স্তরের বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। চাষ এলাকার প্রতিটি ইউনিটে উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষিজীবীদের আরও বেশি আয়ের সুযোগ করে দিতে ওই প্রতিবেদনে সেচের বিস্তার ও নতুন প্রযুক্তির সদ্ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্প্রসারণ কৌশল এখন আরও বেশি উদ্যমশীল হয়েছে। সরবরাহ করা হচ্ছে সুলভ মূল্যের বীজ এবং এসবের ফলে অধিকতর ফলনশীল নতুন ও উন্নত জাতের শস্যচাষে কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ বাড়ছে। এই উদ্যমশীলতাকে এক নতুন উচ্চমাত্রায় নিয়ে যাবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের শীর্ষ গবেষণা সংস্থা বলে পরিচিত আইসিএআর বা ভারতীয় কৃষি গবেষণা পর্ষদ বিগত তিন বছরে ৬০০টি উন্নত মানের শস্যপ্রজাতি উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া ফলন বাড়াতে ক্ষেত্রীয় স্তরে আরও নতুন কয়েকটি কৃষি প্রযুক্তির সপক্ষে প্রচার চালানোর আবশ্যকতা রয়েছে। যেসব প্রকৌশলের অতীব সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে তার কয়েকটি হল সুক্ষতাসম্পন্ন চাষাবাদ, সুসংবদ্ধ কৃষিকাজ, সম্পদ সংরক্ষণভিত্তিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সংরক্ষিত চাষ পদ্ধতি। একইভাবে লেজার ল্যান্ড লেভেলার, সূক্ষ্ম রোপক যন্ত্র ইত্যাদি আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের প্রয়োগ বা নিবিড় ধানচাষ পদ্ধতির মতো কয়েকটি সর্বাধুনিক চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করেও কৃষিক্ষেত্রের বিনিয়োগ লাভজনক হয়ে উঠতে পারে এবং কৃষকদের আয়ও বাড়তে পারে।

কর্ষণযোগ্য জমির প্রতি ইউনিটে আয় বৃদ্ধির আর একটি প্রযুক্তি-নির্ভর পন্থা হল শস্য নিবিড়তার বিস্তৃতি। সেচ ব্যবস্থা ও নতুন প্রকৌশলের প্রসারের ফলে কৃষকরা এখন প্রধান দুই চাষ মরশুম (খারিফ ও রবি) শেষ হবার পর স্বল্পমেয়াদি ফসলের আবাদ করার সুযোগ পাচ্ছেন। পাশাপাশি এটাও উল্লেখ করতে হয় যে, কৃষিকে লাভজনক করে তুলতে সূচনা হয়েছে সুসংবদ্ধ চাষ ব্যবস্থা মডেলের। এমনকি কঠিন ও প্রতিকূল আবহাওয়ার বছরগুলিতেও ওই মডেল অনুসরণ করে স্থিতিশীল আয়ের সংস্থান হতে পারে। উচ্চমূল্যের শস্যের (ফলমূল, শাকসবজি, আঁশ বা ফাইবার, মশলাপতি, ভেষজ গাছপালা) চাষের ক্ষেত্রে বিস্তার ঘটাতে পারলেও কৃষকদের আয় বাড়ানোর বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বনাঞ্চল পত্তন, কৃষিজ সামগ্রীর প্রক্রিয়াকরণ ইত্যাদির মতো ক্ষেত্রগুলিতেও। কৃষকদের আয় ও জীবন-জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধির স্বার্থেই নীতি আয়োগের উল্লেখিত পলিসি-প্রতিবেদনে কৃষিকর্মে নিয়োজিত মানুষদের অন্য পেশায় সরিয়ে আনার জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, দক্ষতা বিকাশে সরকারের সাম্প্রতিক কয়েকটি পদক্ষেপ কৃষিজীবী মানুষদের দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, যাতে করে তারা বিভিন্ন সহজাত বা অ-কৃষি ক্ষেত্রগুলিতেও বর্ধিত আয়ের সুযোগ নিতে পারেন।

নতুন ভিসন

অতীতে সরকারের ভিসন বা কৌশলে প্রাধান্য পেয়েছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য, নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার বিষয়টি। ইদানিং নীতি নির্ধারকরা জোর দিচ্ছেন কীভাবে কৃষকদের আয় বাড়িয়ে তাদের সার্বিক কল্যাণ করা যায় সেই দিকটির ওপর। প্রথম ধাপেই ২০১৫ সালে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রকের নতুন নামকরণ করা হয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক। এরপর থেকে বিভিন্ন সংস্কার, নীতি ও পদক্ষেপের অন্যতম লক্ষ্য, কীভাবে ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ বাড়ানো যায়। অর্থাৎ, নতুন ভিসনের অভিমুখ হল কৃষকদের দুর্দশা লাঘব করে তাদের এবং অ-কৃষি পেশাগুলির কর্মীদের আয়ের মধেও সমতা আনা। 'নতুন ভারত'-এর এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য পুনর্গঠিত ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রটিও এখন সর্বতোভাবে প্রস্তুত।

প্রত্যক্ষ জ্ঞান

অচিন্ত্যরতন দেবতীর্থ

'আপ্তবাক্য সকল আকাশ থেকে আসে না। মানুষের জ্ঞানমার্গে এগুলির উপলব্ধি হয়'—বুদ্ধদেব। বেদ বিভিন্ন ঋষির জ্ঞানের উপলব্ধিমাত্র। প্রবাদবাক্য সকল বহুদর্শনের ফল মাত্র। যেমন 'পুরুষের ভাগ্য ও নারীর চরিত্র দেবতারাও জানেন না। তা মানুষ কি করে জানাবে? 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী'। 'কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামুন মরে।' 'স্বভাব যায় না মলে' ইত্যাদি।

যজ্ঞে পশুবধ করলে সেই পশু যদি স্বর্গে গমন ক'রে কর্তাকে উদ্ধার করে কিংবা শ্রাদ্ধে ব্যক্তিবিশেষকে ভোজন করালে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তাহলে নিজ বাড়িতে বসে পিতা ভোজন করলেই প্রবাসে পুত্রের তৃপ্তি হত। তা হয় কি? এই সব প্রশ্ন করা যেতে পারে।

বিশ্বাস জ্ঞান নয় সংস্কার মাত্র। হয় জ্ঞান বলতে হবে—নয়ত বিশ্বাস। জ্ঞান বিশ্বাস বলে কিছু হয়না। প্রত্যক্ষ দর্শন হচ্ছে জ্ঞান। আর অপ্রত্যক্ষ যা দেখা যায় না তা হল বিশ্বাস মাত্র। যেমন প্রেতের বায়বীর দেহ দেখা যায় না। তবুও অনেকে বলে ভূত দেখেছে। ওটা ভূতের ভয়ের সংস্কার থেকে সৃষ্টি। পরলোক অর্থাৎ পরের জন্ম দেখা যায় না। তবুও অনেকে পরলোকের কথা বলে। কেবলমাত্র অবতার পুরুষই সম্যক জ্ঞান সম্পন্ন হওয়ায় পূণজ্ঞানী হন। তিনি জ্ঞাননেত্রে সব জানতে পারেন। ব্রহ্মজ্ঞ সর্বজ্ঞ হন। বুদ্ধদেবের জাতকের কাহিনীগুলি তার প্রমাণ।

ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত। অবশ্য বেদান্তের অনুভূতি সম্বন্ধে সকলেই একমত। নিরালম্ব নির্বিকল্পসমাধি। 'সেখানে সব শেয়ালেরই এক রা'। 'ব্রহ্ম উচ্ছিষ্ট হননি।' সমাধি থেকে নেমে এসে কেউ তা সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। কেবল ব্রহ্মানন্দের অনুভূতি নিত্যানন্দ অবস্থা বজায় থাকে। যেমন গভীর নিদ্রা সুষুপ্তির পর জেগে উঠলে একটা সুখ অনুভব হয়। সুষুপ্তিতে কোন স্বপ্ন থাকে না। সেইজন্য নিদ্রাকে বলা হয়, সমাধিস্থিতি।

ঈশ্বর যিনি সর্বজ্ঞ সবার আগে জন্মেছেন পরবর্তীকালে যাদের জন্ম হয়েছে সেই মানুষ কি করে তাঁকে জানবে? 'তাঁর ছোট ভাবটাও না, আর বড় ভাবটাও না। তাঁকে কি করে সম্পূর্ণ জানবে? সেইজন্য কেবল তাঁর শরণাগত হয়ে থাকতে হয়। তিনি কৃপা করে যতটুকু জানান তাতেই মজে থাকতে হয়।' পিতা-মাতা ঠাকুরদাকে অনেকেই দেখতে পায় না। নাতি-নাতনির জন্মের পূর্বেই হয়তো তাঁরা গত হয়েছেন। সংস্কার ও বিশ্বাস বশতঃ তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়। ঈশ্বরীয় শক্তি অবশ্যই আছে। এটা বেশ বোঝা যায়। সেই শক্তিদ্বারাই সব কাজ হচ্ছে। এটা মানতেই হবে। সেইজন্য কেউ নাস্তিক নয়। বায়ু দেখা যায় না। গায়ে লাগলে তা বোঝা যায়। গাছের পাতা নড়ে, ধুলা ওড়ে।

বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্ম সূত্র হচ্ছে উত্তর মীমাংসা বা শারীরিক যা শরীরে বর্তায়।--ব্যাসদেব। কর্মফলরূপী ঈশ্বর স্বভাব-প্রকৃতি-সংস্কার যায় না মলে। কেবল অনুমান ও কল্পনা সত্য নয়। এই নিয়েই যত গোলমাল। যা অদৃশ্য এবং যা অপরকে দেখানো যায় না সে সম্বন্ধে কথা না বলাই ভালো।

চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও তন্ত্র শাস্ত্র প্রত্যক্ষফলপ্রদ। প্রত্যয় আনে। কম্পিউটার, গণিত, পদার্থ, রসায়ন ও চিকিৎসা প্রত্যক্ষ সত্য।

গীতা মহাভারতের অংশ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন--'গীতার কথা কাটবার যো নেই। যা আছে ঠিক ঠিক'। রাজযোগ অধ্যায়ে (৯/৩২) শ্রীভগবান বলছেন—তাঁকে আশ্রয় করলে সর্ববর্ণ, স্ত্রীলোকগণ ও পাপযোনি (যারা সর্বদা পাপ করে) সবাই পরমগতি লাভ করবে। একই কথা বলা হয়েছে অশ্বমেধপর্বে (অঃ ১৯) আত্মদর্শনরূপ ধর্ম আশ্রয় করে পরমগতি লাভের কথা। কুর্মপুরাণে (উঃ ১১/১০৪) কাশীতে মরলেও 'ঈশ্বরের কৃপায় সবাই এমনকি পাপযোনিরও মুক্তি হয়।' একথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ, নিরালম্ব ধ্যান ও জ্ঞান দ্বারা মুক্তি। 'ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তাঁর ঠাঁই।' কাশী হচ্ছে সহস্রার। অর্থাৎ, সমাধিতে দেহত্যাগ। স্থিত সমাধিতে মৃত্যু-নির্বাণলাভ। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু জীবন মুক্ত হয়ে বেঁচে থেকে অমৃতত্ব লাভ করে ভক্তি ভক্ত নিয়ে আনন্দে কাল কাটানোর কথা বলেছেন। অদ্বৈত জ্ঞান লাভের পর চৈতন্য হলে তবেই নিত্যানন্দ লাভ হয়। 'অদ্বৈত চৈতন্য নিত্যানন্দ।' শ্রীমদ্ ভাগবত, নারদ পঞ্চরাত্র ও বিষ্ণুউপুরাণে কলিযুগে একমাত্র হরিনাম সংকীর্তনের কথা বলা হয়েছে। 'কলিকালে ঈশ্বরের নাম করাই একমাত্র সাধনা। নামের শক্তির চেয়ে বড় শক্তি কিছু নেই। একাগ্র হয়ে হরিনাম করতে হয়।'—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ

সম্পাদক সমীপেষু

জয়পুরের জঙ্গল

'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর
....
দাও ফিরে তপোবন, পুণ্যছায়া রাশি,
গ্লানিহীন অতীতের দিনগুলি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উচ্চারিত বাণী অমৃতসম। মানুষ নিজ স্বার্থের জন্য জঙ্গলগুলি কেটে বাড়ি, ঘর, রাস্তা , মাঠ তৈরি করছে। সামাজিক স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে তৈরি করছে পরিবেশ অবনমনের এক সুন্দর পথ। যে পথ ধরে আসবে আগামী দিনে খরা, দুর্ভিক্ষ মহামারী কিংবা ক্যান্সারের মতন মারাত্মক মারণ রোগ। মানুষের কি জানা আছে, এ পথ বন্ধ হবে কীভাবে? আসুন শপথ নিই 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' গাছ কাটব না। প্রয়োজনের তাগিদে যদি একটি গাছ কাটতে হয় তার পূর্বে দশটি গাছ রোপণ করব। বনের প্রাচুর্যের জন্য ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার নাম ছিল 'জঙ্গলমহল'। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা নিজস্ব জেলারূপে স্বীকৃতি পায়। তখন জেলার বনভূমির পরিমাণ ছিল ১৪৮২ বর্গ কিলোমিটার। তার মধ্যে জয়পুর জঙ্গলের আয়তন ২৩৭৭৬.৭৩ একর। জেলার ২৭টি বনাঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয়।

জয়পুর জঙ্গলের গ্রাম ও উদ্ভিদ ঃ— বাঁকুড়া জেলার বনের প্রাচুর্যের জন্যই নাম ছিল 'জঙ্গলমহল'। শ্যামসুন্দর শুকুলের 'বাঁকুড়া বনস্মৃতি' (দিব্যা, শারদ সংখ্যা ১৮৩৫) প্রবন্ধে উল্লেখ আছে বনা না বন শব্দের সঙ্গে বহুনাম যুক্ত আছে। যেমন শিউলি বনা, খড়বনা, কেঁদাবনা, বনশোল, বনহাম্বিপুর। জয়পুর ব্লকেও গ্রাম্য পরিসংখ্যান বিচারে অনেক গ্রামের নাম 'বন' নামের সাথে যুক্ত। শাল, পলাশ, মহুয়া জঙ্গলে ঘেরা লালমাটির বাঁকুড়া জেলা। এছাড়া যেসব বড়বড় গাছগুলি সেগুলি হল—পিয়াশাল, সেগুন, বার্মাসেগুন, আম, জাম, কাঁঠাল, কুল, বেল, ডুমুর, খেজুর, তাল, বাবলা, কেঁদ প্রভৃতি। ছোট গাছের মধ্যে কান্টি, ধূতরা, কলকে, কুরচি, বন ও কলা, ভাট, যকেদভাঙরা, নিশিন্দা ইত্যাদি। ডঃ মনীন্দ্রনাথ সান্যালের এক বিশেষ লেখা থেকে জানতে পারি—জয়পুরের বনাঞ্চলে ১৭টি প্রজাতির বৃহৎ বৃক্ষ, ৫২টি প্রজাতির গুল্ম ও কাষ্ঠলতা এবং ১২টি প্রজাতির পরজীবী উদ্ভিদ লক্ষ্য করা যায়।

জয়পুর জঙ্গলের গ্রাম ও পশুপক্ষী ঃ— জঙ্গলে বিভিন্ন ধরণের পশুপক্ষী লক্ষ্য করা যায়। পশুদের মধেও বনশুকর, হরিণ, হায়না, শিয়াল, ভাল্লুক, কৃষ্ণসার বন্যহাতি। এছাড়া খরগোস, বনরুউ দেখা যায়। বিভিন্ন ধরণের পক্ষী--বন্যমুরগী, ময়ূর, কাক, শকুনি, চিল লক্ষ্য করা যায়। শীতকালে মরশুমী পাখির দল জঙ্গলের বিভিন্ন জলাশয়কে কেন্দ্র করে বাস করে। -''বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'— যদি জঙ্গলে পশুপাখি বা অন্যান্য প্রাণী না থাকতো তবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারিয়ে যেত। এদের বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের। তাই কবির কণ্ঠে উচ্চারিত বাণীর সঙ্গে আমরাও বলি—

'বন্যপ্রাণী করজোড়ে বলে
বনেতে মোদের থাকতে দাও।
বন বলেছে করজোড় করে
বাঁচিলে দেব তোমরা যা চাও।'

— ড. প্রসেনজিৎ সরকার, বাঁকুড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বাদলেরবিরুদ্ধে নয়।...........সম্পাদকীয় দফতর।

লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

পাঠকের দরবারে

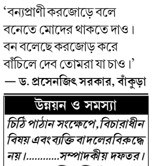

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়